রবীন্দ্র কবিতায় পুরাণের প্রয়োগ ও বিনির্মাণ

ড. দেবশ্রী ঘোষ বিশ্বাস

সহ অধ্যাপিকা,বাংলা বিভাগ হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন
দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা

রবীন্দ্রসাহিত্যে বেদ, উপনিষদ, ও পৌরাণিক সাহিত্যের প্রভাব অপিরিসীম। মূলত সংস্কৃত ধারার উপাদান তাঁর ভাবনাকে অনেকাংশে পরিপুষ্ট করেছে। পৌরাণিক অনুসংগকে মননরিদ্ধ ভঙ্গিতে, নিজ সৃষ্টিতে প্রয়োগ করেছেন। চরিত্র ও ঘটনার বিনির্মান করেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে, প্রাচীন সাহিত্য, নাটক, কাব্যনাট্য ও কাব্য-কবিতায় পুরাণ চর্চাকে প্রসারিত করেছেন।

প্রাচীন বা পুরাকাল থেকে লোকমুখে ব্যক্ত হয়ে আসা কাহিনী হল পুরাণ। ইতিহাস ও পুরাণ অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক যুক্ত। পুরাণের রচনাকাল নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। প্রচলিত মত, বেদ রচনার আগেই পুরান রচিত হয়েছিল। রামায়ণ-মাহাভারতের কাহিনীতে পুরানের উল্লেখ আছে, সমালোচক winternitz এর মতে মহাভারত লেখার অনেক আগেই পুরানের সংকলন হয়েছিল। কারণ কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে পুরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পুরানের ইংরেজী হিসাবে মিথ (mith) শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। যদিও মিথ ও পুরানের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। রামায়ণ – মহাভারতের পৌরাণিক অভিধাটি সম্প্রসারিত হয়েছে সাহিত্যক্ষেত্রে। রামায়ণের উৎপত্তি হয়েছে ত্রেতা যুগে আর মহাভারতের দ্বাপরে। মহাভারতের কৃষ্ণ ও রামায়ণের শ্রীরাম উভয়েই বিষ্ণুর অবতার রূপে চিত্রিত। মহাভারতের কাহিনীতে, রামায়নের প্রক্ষেপ লক্ষ্যনীয় কিন্তু রামায়ণে তা নেই। মহাভারতের বাচনভঙ্গিমা, কাহিনীবিন্যাস, উপাদান বিশ্লেষণ করে বলা যায় – মহাভারতে কূটনীতি, ধর্মনীতি, যুদ্ধনীতি, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন জটিল বিষয়ের উপস্থাপনা প্রমাণ করে মহাভারত পরের রচনা। কারণ রামায়ণে সমাজ-জীবন-জীবিকা-স্বার্থ নেই, বরং উল্টো চিএ প্রতিভাত হয়।

রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী ছিলেন। বিশেষত রামায়ণের প্রতি। রবীন্দ্র মতে রামায়ণ রূপক কাহিনী মাত্র। সমাজবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, সবই এতে নিহিত। রাবণ= ঈশ্বর, রাম=রমনীয়তা, লক্ষ্মণ= সৌন্দর্য ও সম্পদ, সীতা=রেখা। অর্থাৎ রাম-লক্ষ্মন-সীতা কৃষিবিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত। কাজের সঙ্গে শস্যশ্যামলা ভূমির ধারনা। তাই রামচন্দ্র 'নবদূর্বাদলশ্যাম'। রাম ও রাবণের যুদ্ধ আসলে কৃষি সভ্যতার সঙ্গে ধণতান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধ। রামায়ণের কাহিনী তিনি 'প্রাচীন সাহিত্য', 'পঞ্চভূত' 'বাল্মিকী প্রতিভ''চিত্রাঙ্গদা' 'কর্ণকুন্তীসংবাদ" এ ব্যবহার করেছেন। কিছু কিছু কবিতা বিশেষত 'ব্রাহ্মণ', 'পতিতা', 'অহল্যা' তেও উপাদান স্বরূপ গ্রহন করেছেন। আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ বা অনুকরন বলা যাবে না। কারণ রামায়ণের কাহিনী সূত্রকে নিয়েছেন মাত্র। তার পর আপন মনের জারক রসে জারিত করে তার বিনির্মান করেছেন।

'ব্রাহ্মণ' কবিতার রচনাকাল ১৩০১ বঙ্গাব্দ। সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে চতুর্থ খন্ড থেকে সত্যকাম জবালার কাহিনী নবম খন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। কাহিনীটি এই রকম- জবালা মহর্ষি সত্যকামের মাতা। যৌবনে তিনি বহুচারিনী ছিলেন, সেই সময় তাঁর গর্ভে সত্যকামের জন্ম। তিনি বিদ্যার্থীরূপে মহর্ষি গৌতমের নিকট উপস্থিত হলে তাঁর গোত্র জানতে চান। কিন্তু সত্যকাম মাতার কাছে নিজ গোত্র সম্পর্কে জানতে পারেন নি এবং জানতে না পারার কারন ও মহর্ষিকে জানান। ঋষি গৌতম সত্যকামের এই স্পষ্টবাদিতায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন 'তুমি সত্যভ্রষ্ট হও নি, ব্রাহ্মণ ভিন্ন কারও পক্ষে এইরূপ সত্যভাষণ সম্ভব নয়'।– (পৌরাণিক অভিধান। পৃষ্ঠা-১৭৮)

পুরাণ অনুযায়ী ঋষি গৌতম সত্যকামকে চারশত কৃশ ও দুর্বল গোরু দিয়ে বলেছিলেন, তুমি এদের নিয়ে যাও । সত্যকাম বিদায়কালে বলেন- সহস্রপূর্ণ না হলে তিনি ফিরে আসবেন না। এই কাহিনীর সবটুকু রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন না। সত্যকামের সততায় মুগ্ধ হয়ে গৌতম ব্রাহ্মজ্ঞানে তাঁকে শিষ্য হিসাবে গ্রহন করেছেন, এখানেই কবিতটির সমাপ্তি। এই পুরাণ কাহিনীর বির্নিমান ঘটিয়েছেন কবি। গৌতম ব্রাহ্মণ ছাড়া কাউকে শিষ্যত্বে গ্রহন করেন না, এ কথা সত্যকাম জানতেন তাই ঋষির কাছে আসার আগে মাতার কাছে নিজের গোত্র জানতে চেয়েছিলেন। অথচ কবিতায় দেখা যায় , গৌতমের কাছে নির্দেশিত হয়েই তাঁর গোত্র জানতে চাইছেন। এই ঘটনায় বালক

সত্যকামের সারল্য,নিষ্পাপ মনের সুকুমারতা প্রকাশ পাচ্ছে । কিন্তু মূল কাহিনীতে এই সরলতা ছিল না। কবি সচেতন ভাবেই সত্যকামকে বির্নিমান করেছেন তা স্পষ্ট। মাতা জবালার কাছে সত্যকামের তিনটি প্রশ্ন ছিল-

'___কহো গো জননী, মোর পিতার কি নাম

কী বংশে জনম

মাতা কি গোত্র আমার?'

তিনটি প্রশ্ন পরস্পর সংশ্লিষ্ট---১। পিতার নাম ২। বংশ পরিচয় ৩। কি গোত্র। উত্তরে জবালা দ্বিধান্বিত হয়ে শুধু নত মুখে স্পষ্টভাষায় জানালেন---

" যৌবনে দারিদ্র দুঃখে

বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,

জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে

গোত্র তব নাহি জানি তাত"!

জবালা স্বভাব দোষে নয়, দারিদ্রের কারণে বাধ্য হয়েছিলেন বহুজনের পরির্চচা করতে। এই তথ্য জবালার 'বহু পরিচর্চা'র কলঙ্কের গুরুভার মুহূর্তেই অনেকটা লঘু করে দেয়। নারীত্ব ও মাতৃত্বের পরিচয়ে সে এক দৃঢ়চেতা পৌরাণিক নারী। সত্যকাম চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ পুরানাশ্রিত রসের অনুগমন করেছেন। তাঁর চরিত্রায়নের এক বিশিষ্ট পদ্ধতি ও এখানে রূপায়িত। অধর্ম বা অন্যায় যে রূপেই আসুক না কেন রবীন্দ্র সৃষ্ট চরিত্ররা অসম্ভব দৃঢ় ও প্রতিবাদী, এরা গোত্রহীন পিতৃ পরিচয়হীন। যেমন অভিজিত বা গোরা। লক্ষ্যনীয়, কেউ তাদের প্রকৃত জন্মরহস্য জানার পর আত্মগ্লানিতে বা অত্মযন্ত্রনায় দীর্ন হয় নি বরং অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিঃশঙ্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে।

তাই সত্যকামেরও মনস্কাম পূর্ণতার ইঙ্গিত দিয়ে কবিতাটি শেষ করেছেন। পৌরনিক অনুসঙ্গের বির্নিমান করেছেন ঊনবিংশ শতকের গভীর মনীষায়।

'পতিতা' কবিতাটির কাহিনী বস্তু রবীন্দ্রনাথ গ্রহন করেছিলেন মহাভারত মহাকাব্য থেকে। বন পর্বের ১১১সংখ্যক অধ্যায়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনী আছে। আবার রামায়নেও রাজা দশরথের পুত্র কামনায় যজ্ঞের প্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনী বর্নিত হয়েছে। কাশ্যব তনয় বিভান্ডক মুনির পু ঋষ্যশৃঙ্গ। একদা অঙ্গরাজ লোমপাদ রাজ্যকে ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে মন্ত্রীর পরামর্শে তপস্যারত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে আনতে বারবণিতাদের পাঠান। মুনি বনবাসী ও বেদ পাঠরত। মনুষ্যসমাজ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ । তাঁকে প্রলুব্ধ করে নগরে নিয়ে আসেন। দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে অঙ্গরাজ্যে বৃষ্টি শুরু হয় এবং রাজা নিজ কন্যা শান্তার সঙ্গে মুনির বিবাহ দেন। তাঁরা এই রাজ্যে বসবাস করতে থাকেন। মহাভারতে যেমন একাধিক বারবণিতার উল্লেখ আছে, রামায়ণে এক বৃদ্ধা বণিতার একাকি কন্যার কথা আছে। মূল কাহিনী থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পতিতা' কবিতায় অনেক বণিতার মধ্যে এক জন কে বেছে নিয়েছেন, যে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ছলনা করতে গিয়ে তাঁর পবিত্র, নিষ্পাপ দৃষ্টিতে নবজন্ম লাভ করেছে।মুনি জীবনে কোন নারী দেখেন নি। স্বাভাবিক ভাবেই মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি গণিকার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে,গণিকাও জীবনে প্রথমবার লুব্ধতামুক্ত নিষ্কলুষ দৃষ্টির সামনে পড়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে—

"কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে
কোন দেব আজ আনিলে দিবা—
তোমার পরশ অমৃতরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা"।

এই কবিতারটির বাখ্যা কবি নিজেই করেছেন---"রমনী পুষ্পতুল্য তাহাকে ভোগ বা পূজায় তুল্যভাবে নিয়োগ করা যাইতে পারে,তাহাতে কদর্যতা বা পবিত্রতা প্রকাশ পায়, তাহা ফুল বা রমনীকে স্পর্শ করে না—ফুল বা রমণী চির পবিত্র চির অনাবিল—তাহাতে ফুলের বা রমণীর কোন

ইচ্ছাই মানা হয় না বলিয়া সে ভোগে বা পূজায় নিয়জিত হয় এবং তাহাতে নিয়োগ কর্তার –ই মনের কদর্যতা এবং পবিত্রতা প্রকাশ পায় মাত্র"।

ঋষিকুমার পতিতার কালিমা লিপ্ত জীবনে প্রথম পবিত্র প্রেমের স্পর্শ দিলেন। বহুবল্লবা নারীর হৃদয়েও যে প্রসবন প্রবাহিত হয়। যা ফল্গুধারার মত – তাকেই ঋষি দৃশ্যমান করলেন। যৌবনের শরীরী বিভঙ্গে ,বিলোল কটাক্ষে ও দৈহিক কামজ সৌন্দর্য নিয়ে গণিকাটি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে সাময়িক ভাবে আচ্ছন্ন করে জয়ী হয়েছিল। সিদ্ধ হয়েছিল তার কর্ম। হৃদয়ের দেবতা তার কাছে ঘুমন্ত। তাদের অভিসার রাত্রিকালীন।পতিতা নারীটি তার পাপ কর্ম সম্পর্কে সচেতন। তারা নরকের পথে আলো জ্বালায় কিন্তু সে আলোয় কোন মঙ্গল নেই, শুভ্রতা নেই, তা অন্তরকে সমুজ্বল করে না। তাই সে বলে –

"দেবতা ঘুমলে আমাদের দিন
দেবতা জাগিলে মোদের রাতি
ধরার নরক সিংহদুয়ার
জ্বালাই আমরা সন্ধ্যাবাতি"।

ঋষির নিষ্পাপ চোখের দিকে তাকিয়ে সে অনুভব করল শরীর উত্তীর্ন প্রেম। তার পতিতা পরিচয় মুছে গিয়ে জেগে উঠল চিরন্তন নারী হৃদয়—

"হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয় ভেরি"।

মেঘ যেমন ব্রজের দাহকে ঢেকে দেয় তেমনি ঋষ্যশৃঙ্গের প্রেম উদ্দামতাকে সংহত করেছে। প্রেমের উজ্জ্বল আলোর মতো ঋষির প্রেম তার অন্তরআত্মাকে আলোকিত করেছে।প্রেম মানুষের জীবনের চকিত উদ্ভাস, তারপর তা সারা জীবন ধরে ধ্রুব তারার মত পথ দেখায়। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অনুসারে অনেক বারবনিতা মিলে রাজ আদেশে মুনির ধ্যান ভঙ্গ করার ছবি আছে। কবি এখানে মাত্র এক জন পতিতা নারীর হৃদয় যন্ত্রনার ছবি একেছেন। এক বারাঙ্গানার

মধ্যে প্রকৃত প্রেমের জাগরণ ঘটিয়ে তাকে নারীত্বে উত্তোরণ করেছেন। দৈহিক শুচিতা সত্বীতের লক্ষন নয়, যে নারী আপন প্রেমের গৌরবে গৌরবান্বিত , প্রকৃত নারী সেই। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলতে চেয়েছেন সোহিনির মধ্যে দিয়ে।নারীর অন্তর শুচিতা ও সতীত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'পতিতা' কবিতা। পুরানাশ্রিত একটি ঘটনাকে ব্যবহার করেছেন মাত্র।

'অহল্যার প্রতি' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। অহল্যা পুরান নির্ভর চরিত্র। মহাভারতে অহল্যার উপাখ্যান আছে। ব্রহ্মার মানস কন্যা অহল্যা শব্দের অর্থ সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত ।সত্যযুগে তাঁর জন্ম। বিশেষ কার্য উপলক্ষ্যে ব্রহ্মা তাকে ঋষি গৌতমের কাছে রেখে যান। পরে মুনি নিষ্পাপ অবস্থায় অহল্যাকে পিতার কাছে প্রত্যার্পন করেন। ব্রহ্মা খুশি হয়ে গৌতম মুনির সঙ্গে অহল্যার বিবাহ দেন। অন্যদিকে দেবরাজ ইন্দ্র এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। তিনি মনে করতেন, প্রকৃত অর্থে এমন অদ্বিতীয়া সুন্দরী তাঁরই স্ত্রী হবার যোগ্য। একদিন গৌতম মুনির অনুপস্থিতির সুযোগে ইন্দ্র, মুনির রূপ ধরে অহল্যাকে কামনা করে। ইন্দ্রের ছলনা ধরতে পেরেও সে নিজেকে সমর্পন করে। পরিতৃপ্ত অহল্যা মুনি ফিরে আসার আগেই ইন্দ্রকে আশ্রম ত্যাগ করতে বলে, কিন্তু ইন্দ্র সে সুযোগ পান নি। স্বাভাবিক ভাবে দুজনেই ঋষি কর্তৃক অভিশপ্ত হন। ইন্দ্রকে তিনি বলেন—'তোর মুষকদ্বয় স্খলিত হোক' এবং অহল্যাকে বলেন-- 'তোকেও সবার অদৃশ্য হয়ে ভস্মরাশিতে শুয়ে শুধু বায়ু ভক্ষণ করে, দীর্ঘকাল কাটাতে হবে। পরে কোন কালে রামের করুনায় তুই পাপ মুক্ত হবি'। (গদ্য বাল্মীকি রামায়ন, জ্যোতিভূষণ চাকী , অষ্টাচত্বারিং সর্গ, পৃষ্ঠা ৩৫)

পৌরাণিক অহল্যাকে রবীন্দ্রনাথ 'অহল্যারপ্রতি' কবিতায় বিনির্মান করলেন, তাঁর নিজস্ব প্রকৃতি ভাবনা ও বিশ্বচেতনা বোধের আলোকে। রামের পাদস্পর্শে অহল্যা শরীরী অবয়ব প্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমে দিব্য জ্যোতিতে বিশ্বলোক ভরে গেল। যা সমস্ত বাসনা,কামনা, লোভ মুক্ত। নিষ্কোলুষ দিব্য জ্যোতি। বাল্মীকি যাকে বলেছেন –'মায়াবতী দিব্য প্রতিমা'। যার বিকিরণ 'দীপ্ত সূর্যপ্রভা তুল্য'।আর এখান থেকে রবীন্দ্র কবিতাটি সূচনা। কবির ধারনা পাষান রূপী অহল্যা ধরনীর সঙ্গে একাত্ম থাকলেও তার মধ্যে প্রানের স্পন্দন ছিল, ছিল চেতনা—"কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবা নিশি/ অহল্যা পাষাণ রূপে ধরাতলে মিশি"। প্রানের সৃষ্টি প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতি তাঁর কাছে মাতৃস্বরূপা। অহল্যাতো মাতৃগর্ভেই বিলিন হয়েছিল। সে তার অভিশপ্ত জীবন অতিবাহিত করে নি, বরং তার

সন্তপ্ত জীবনকে আশ্রয় দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন জননী। ছিন্নপত্রে তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন ৭০ সংখ্যক পত্রে—

"এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যমল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত"। বৈশ্বিক ভাবনা কবিকে সংহত করেছে অহল্যার নব নির্মানে। কবি সৃষ্ট অহল্যা প্রকৃতি সম্ভূতা, তিনি তিলোত্তমা। Etarnal beauty র অলোকে উদ্ভাসিত। অহল্যার মানবী সৌন্দর্যকে তিনি দেশ কালের সমস্ত বন্ধনের উর্দ্ধে স্থাপন করতে চেয়েছেন বলেই 'কুমারী' অভিধাটি আরোপ করেছেন।

"দিলে আজি দেখা

ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো

সুন্দর সরল শুভ্র"—

অহল্যা শুধু সুন্দরীই নন। তিনি সর্বপ্রকার মালিন্য মুক্ত। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্য ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে 'অহল্যারপ্রতি' কবিতায়। কবি নিজের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার জন্য পুরান বর্ণিত অহল্যার মিথকে ব্যবহার করেছেন। শাপ মুক্ত অহল্যাকে প্রকৃতির বিস্তৃত পটভূমিকায় রেখে বিশ্বের সৌন্দর্যভাবনা কে তাঁর ভাষায় 'অধরামাধুরী' কে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। এই অনুভবে পুরানের ধূসর অন্ধকারাচ্ছন্ন Mythology র জগত ছেড়ে রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণময় প্রানচঞ্চল বিশ্বের আলোকে উদ্ভাসিত অহল্যা মুক্তি লাভ করেছে।

এই প্রাচীন পৌরাণিক সাহিত্যকে কাহিনী সূত্রে গ্রহন করে রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ-বিংশ শতকের আধুনিক মননে যে ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাহিত্যে প্রতিস্থাপন করেছেন, তা তাঁর মতো 'একমেবাদ্বিতীয়ম' প্রাজ্ঞ ঋষির পক্ষেই সম্ভব। প্রায় প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রের বির্নিমান ঘটিয়েছেন তিনি।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১) পৌরাণিক অভিধানঃ সুধীরচন্দ্র সরকার (এম.সি.সরকার ১৪০৮)

২) রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্যঃ কল্যানী শঙ্কর ঘটক (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০)

৩) রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ১৪০৬)

৪) পুরাণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথঃ ড. দিলীপ রায় (এন.ই.পাব্লিশার্স ২০০৮)